লুক্‌মান

৩১

নামকরণ

এ সূরার দ্বিতীয় রুকূ'তে লুকমান হাকীমের উপদেশাবলী উদ্ধৃত করা হয়েছে। তিনি নিজের পুত্রকে এ উপদেশ দিয়েছিলেন। এই সুবাদে এ সূরার লুকমান নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরার বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে পরিষ্কার বুঝা যায়, এটি এমন সময় নাযিল হয় যখন ইসলামের দাওয়াতের কন্ঠরোধ এবং তার অগ্রগতির পথরোধ করার জন্য জুলুম-নিপীড়নের সূচনা হয়ে গিয়েছিল এবং এ জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা হচ্ছিল। কিন্তু তখনও বিরোধিতার তোড়জোড় ষোলকলায় পূর্ণ হয়নি। ১৪ ও ১৫ আয়াত থেকে এর আভাস পাওয়া যায়। সেখানে নতুন ইসলাম গ্রহণকারী যুবকদের বলা হয়েছে, পিতা-মাতার অধিকার যথার্থই আল্লাহর পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তারা যদি তোমাদের ইসলাম গ্রহণ করার পথে বাধা দেয় এবং শিরকের দিকে ফিরে যেতে বাধ্য করে তাহলে তাদের কথা কখনোই মেনে নেবে না। একথাটাই সূরা আনকাবূতেও বলা হয়েছে। এ থেকে জানা যায়, দু'টি সূরাই একই সময় নাযিল হয়। কিন্তু উভয় সূরার বর্ণনা রীতি ও বিষয়বস্তুর কথা চিন্তা করলে অনুমান করা যায় সূরা লুকমান প্রথমে নাযিল হয়। কারণ এর পশ্চাতভূমে কোন তীব্র আকারের বিরোধিতার চিহ্ন পাওয়া যায় না। বিপরীত পক্ষে সূরা আনকাবূত পড়লে মনে হবে তার নাযিলের সময় মুসলমানদের ওপর কঠোর জুলুম নিপীড়ন চলছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরায় লোকদের বুঝানো হয়েছে, শিরকের অসারতা ও অযৌক্তিকতা এবং তাওহীদের সত্যতা ও যৌক্তিকতা। এই সংগে আহবান জানানো হয়েছে এই বলে যে, বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণ ত্যাগ করো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্ব-জাহানের মালিক আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে যে শিক্ষা পেশ করছেন সে সম্পর্কে উন্মুক্ত হৃদয়ে চিন্তা-ভাবনা করো এবং উন্মুক্ত দৃষ্টিতে দেখো, বিশ্ব-জগতের চারদিকে এবং নিজের মানবিক সত্তার মধ্যেই কেমন সব সুস্পষ্ট নিদর্শন এর সত্যতার সাক্ষ দিয়ে চলছে।

এ প্রসংগে একথাও বলা হয়েছে, দুনিয়ায় বা আরবদেশে এই প্রথমবার মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি আওয়াজ উঠানো হয়নি। আগেও লোকেরা বুদ্ধি-জ্ঞানের অধিকারী ছিল এবং তারা একথাই বলতো যা আজ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন। তোমাদের নিজেদের দেশেই ছিলেন মহাজ্ঞানী লুকমান। তাঁর জ্ঞান-গরিমার কাহিনী তোমাদের এলাকায় বহুল প্রচলিত। তোমরা নিজেদের কথাবার্তায় তাঁর প্রবাদ বাক্য ও জ্ঞানগর্ভ কথা উদ্ধৃত করে থাকো। তোমাদের কবি ও বাগ্মীগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার কথা বলেন। এখন তোমরা নিজেরাই দেখো তিনি কোন্ ধরনের আকীদা-বিশ্বাস ও কোন্ ধরনের নীতি-নৈতিকতার শিক্ষা দিতেন।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

الٓمٓ ۝١ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۝٢ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ۝٣ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝٤ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝٥

আলিফ লাম মীম। এগুলো জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত।[১] পথনির্দেশনা ও অনুগ্রহ সৎকর্মশীলদের জন্য[২] যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আখেরাতে বিশ্বাস করে।[৩] এরাই তাদের রবের পক্ষ থেকে সঠিক পথে রয়েছে এবং এরাই সাফল্য লাভ করবে।[৪]

১. অর্থাৎ এমন কিতাবের আয়াত যা জ্ঞানে পরিপূর্ণ, যার প্রত্যেকটি কথা জ্ঞানগর্ভ।

২. অর্থাৎ এ আয়াতগুলো সঠিক পথনির্দেশক এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহের রূপলাভ করে এসেছে। কিন্তু এ পথনির্দেশনা ও অনুগ্রহ থেকে লাভবান হয় একমাত্র তারাই যারা সৎকাজ করার পথ অবলম্বন করে, সৎ হতে চায়, কল্যাণ ও ন্যায়ের সন্ধান করে এবং অসৎকাজ সম্পর্কে যখনই সতর্ক করে দেয়া হয় তখনই তা পরিহার করে এবং কল্যাণ ও ন্যায়ের পথ যখনই সামনে খুলে রেখে দেয়া হয় তখনই সে পথে চলতে শুরু করে। আর যারা অসৎকাজ করে ও অসৎ মনোবৃত্তির অধিকারী তারা এ পথনির্দেশনা থেকে লাভবান হবে না এবং এ অনুগ্রহেরও কোন অংশ পাবে না।

৩. যাদেরকে সৎকর্মশীল বলা হয়েছে তারা কেবলমাত্র এ তিনটি গুণাবলীর অধিকারী, একথা বলা হয়নি। আসলে প্রথমে 'সৎকর্মশীল' শব্দটি ব্যাপক অর্থে বর্ণনা করে এদিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, এ কিতাব যেসব অপকর্মে বাধা দেয় এ সৎকর্মশীলরা সেসবগুলো থেকেই বিরত থাকে। আর এ কিতাব যেসব সৎকাজ করার হুকুম দেয় এরা সেসবগুলোই করে। তারপর এ "সৎকর্মশীলদের" তিনটি গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে একথা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য যে, বাদবাকি সমস্ত সৎকাজ কিন্তু এ তিনটি সদগুণের ওপরই নির্ভর করবে। তারা নামায কায়েম করে। এর ফলে আল্লাহর হুকুম মেনে চলা ও আল্লাহর ভয়ে ভীত হওয়া তাদের স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তারা যাকাত দেয়। এর ফলে আত্মত্যাগের প্রবণতা তাদের মধ্যে সুদৃঢ়

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۗ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِىْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

আর মানুষদেরই মধ্যে এমনও কেউ আছে,[৫] যে মনোমুগ্ধকর কথা[৬] কিনে আনে লোকদেরকে জ্ঞান ছাড়াই[৭] আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য এবং এ পথের আহবানকে হাসি–ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেয়।[৮] এ ধরনের লোকদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব।[৯] তাকে যখন আমার আয়াত শুনানো হয় তখন সে বড়ই দর্পভরে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয় যেন সে তা শুনেইনি, যেন তার কান কালা। বেশ, সুখবর শুনিয়ে দাও তাকে একটি যন্ত্রণাদায়ক আযাবের। তবে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত,[১০] যেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এ হচ্ছে আল্লাহর অকাট্য প্রতিশ্রুতি এবং তিনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানময়।[১১]

ও শক্তিশালী হয়, পার্থিব সম্পদের প্রতি মোহ প্রদমিত হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আকাংখা জেগে ওঠে। তারা আখেরাতে বিশ্বাস করে। এর ফলে তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহি করার অনুভূতি জাগে। এর বদৌলতে তারা এমন জন্তু–জানোয়ারের মতো হয় না যারা চারণক্ষেত্রে বাঁধনহারা হয়ে এদিক ওদিক চরে বেড়ায়। বরং তারা এমন মানুষদের মতো হয়ে যায় যারা নিজেদেরকে স্বেচ্ছাচারী মনে করে না। মনে করে, তারা কোন প্রভুর গোলাম এবং নিজেদের সমস্ত কাজের জন্য প্রভুর সামনে জবাবদিহি করতে বাধ্য। এ তিনটি বিশেষত্বের কারণে এ "সৎকর্মশীলরা" ঠিক তেমনি ধরনের সৎকর্মশীল থাকে না যারা ঘটনাক্রমে কোন সৎকাজ করে বসে এবং তাদের অসৎকাজও তেমনি সৎকাজের মতো একই ধারায় অনুষ্ঠিত হতে পারে। পক্ষান্তরে এ বিশেষত্বগুলো তাদের মধ্যে একটি চিন্তা ও নৈতিক ব্যবস্থার জন্ম দেয় যার ফলে তাদের সৎকাজগুলো একটি ধরা বাঁধা নিয়মানুসারে অনুষ্ঠিত হতে থাকে এবং অসৎকাজ যদি কখনো হয়ে যায়ই তাহলে তা হয় ঘটনাক্রমে। তাদের কোন গভীর চিন্তা ও নৈতিক উদ্যোগ তাদেরকে নিজেদের প্রাকৃতিক চাহিদা অনুসারে অসৎপথে নিয়ে যায় না।

৪. যে সময় এ আয়াত নাযিল হয় তখন মক্কার কাফেররা মনে করতো এবং প্রকাশ্যে বলতো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর এ দাওয়াত গ্রহণকারী

লোকেরা নিজেদের জীবন ধ্বংস করে চলছে। তাই একেবারে নির্দিষ্ট করে এবং পুরোপুরি জোর দিয়ে বলা হয়েছে, "এরাই সফলকাম হবে।" অর্থাৎ এরা ধ্বংস হবে না, যেমন বাজে ও উদ্ভট চিন্তার মাধ্যমে তোমরা মনে করে বসেছো। বরং এরাই আসলে সফলকাম হবে এবং যারা এপথ অবলম্বন করতে অস্বীকার করেছে তারাই হবে অকৃতকার্য।

এখানে যে ব্যক্তি সাফল্যকে শুধুমাত্র এ দুনিয়ার চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং তাও আবার বৈষয়িক প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি অর্থে গ্রহণ করবে, কুরআনের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করার ব্যাপারে সেও মারাত্মক ভুল করবে। সাফল্যের কুরআনী ধারণা জানার জন্য নিম্নলিখিত আয়াতগুলো তাফহীমুল কুরআনের ব্যাখ্যা সহকারে গভীরভাবে অধ্যয়ন করা উচিত। আল বাকারা, ২–৫; আলে ইমরান, ১০৩, ১৩০ ও ২০০; আল মা–য়েদাহ, ৩৫ ও ৯০; আল আন'আম, ২১; আল 'আরাফ, ৭–৮ ও ১৫৭; আত্ তাওবাহ, ৮৮; ইউনুস, ১৭; আন্ নাহ্ল, ১১৬; আল হাজ্জ, ৭৭; আল মু'মিনূন, ১ ও ১১৭; আন নূর, ৫১; এবং আর রূম, ৪৮ আয়াত।

৫. অর্থাৎ একদিকে তো আল্লাহর পক্ষ থেকে এ পথনির্দেশনা ও অনুগ্রহ এসেছে, যা থেকে কিছু লোক লাভবান হচ্ছে। অন্যদিকে ঐ সমস্ত সৌভাগ্যবান লোকদের পাশাপাশি এমন দুর্ভাগা লোকেরাও রয়ে গেছে যারা আল্লাহর আয়াতের মোকাবিলায় এ কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছে।

৬. আসল শব্দ হচ্ছে "লাহ্ওয়াল হাদীস" অর্থাৎ এমন কথা যা মানুষকে আত্ম–সমাহিত করে অন্য প্রত্যেকটি জিনিস থেকে গাফিল করে দেয়। শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে এ শব্দগুলোর মধ্যে নিন্দার কোন বিষয় নেই। কিন্তু খারাপ, বাজে ও অর্থহীন কথা অর্থে শব্দটির ব্যবহার হয়। যেমন গালগল্প, পুরাকাহিনী, হাসি–ঠাট্টা, কথা–কাহিনী, গল্প, উপন্যাস, গান বাজনা এবং এ জাতীয় আরো অন্যান্য জিনিস।

'লাহ্ওয়াল হাদীস' কিনে নেয়ার এ অর্থও হতে পারে যে, ঐ ব্যক্তি সত্য কথা বাদ দিয়ে মিথ্যা কথা গ্রহণ করে এবং সঠিক পথনির্দেশনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে এমন কথার প্রতি আগ্রহান্বিত হয় যার মাধ্যমে তার জন্য দুনিয়াতেও কোন মংগল নেই এবং আখেরাতেও নেই। কিন্তু এটি এই বাক্যাংশটির রূপক অর্থ। এর প্রকৃত অর্থ এই যে, মানুষ তার নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে কোন বাজে জিনিস কিনে। এ ব্যাখ্যার সমর্থনে বহু হাদীসও রয়েছে। ইবনে হিশাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, মক্কার কাফেরদের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যখন এ দাওয়াত সম্প্রসারিত হয়েই চলছিল তখন নদ্বর ইবনে হারেস কুরাইশ নেতাদেরকে বললো, তোমরা যেভাবে এ ব্যক্তির মোকাবিলা করছো, তাতে কোন কাজ হবে না। এ ব্যক্তি তোমাদের মধ্যেই জীবন যাপন করে শৈশব থেকে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেছে। আজ পর্যন্ত নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে সে ছিল তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে সত্যবাদী ও সবচেয়ে বিশ্বস্ত লোক। এখন তোমরা বলছো, সে গণক, যাদুকর, কবি, পাগল। একথা কে বিশ্বাস করবে? যাদুকর কোন্ ধরনের তুক্তাক কারবার চালায় তা কি লোকেরা জানে না? গণকরা কি সব কথাবার্তা বলে তা কি লোকদের জানতে বাকি আছে? লোকেরা কি কবি ও কবিতা চর্চার ব্যাপারে অনভিজ্ঞ? পাগলরা কেমন কেমন করে তাকি লোকেরা জানে না? এ দোষগুলোর মধ্য থেকে কোন্‌টি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর ওপর

প্রযোজ্য হয় যে, সেটি বিশ্বাস করার জন্য তোমরা লোকদেরকে আহবান জানাতে পারবে? থামো, এ রোগের চিকিৎসা আমিই করবো। এরপর সে মক্কা থেকে ইরাক চলে গেলো। সেখান থেকে অনারব বাদশাহদের কিস্সা কাহিনী এবং রুস্তম ও ইসফিন্দিয়ারের গল্পকথা সংগ্রহ করে এনে গল্প বলার আসর জমিয়ে তুলতে লাগলো। তার উদ্দেশ্য ছিল, এভাবে লোকেরা কুরআনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং এসব গল্প-কাহিনীর মধ্যে ডুবে যাবে। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, ৩২০-৩২১ পৃঃ) আসবাবুন নযুলের মধ্যে এ বর্ণনাটি ওয়াহেদী কাল্বী ও মুকাতিল থেকে উদ্ধৃত করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) এর ওপর আরো এতটুকু বৃদ্ধি করেছেন যে, নদ্বর এ উদ্দেশ্যে গায়িকা বাঁদীদেরকেও কিনে এনেছিল। কোন ব্যক্তি সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথায় প্রভাবিত হতে চলেছে বলে তার কাছে খবর এলেই সে তার জন্য নিজের একজন বাঁদী নিযুক্ত করতো এবং তাকে বলে দিতো ওকে খুব ভালো করে পানাহার করাও ও গান শুনাও এবং সবসময় তোমার সাথে জড়িয়ে রেখে ওদিক থেকে ওর মন ফিরিয়ে আনো। বিভিন্ন জাতির বড় বড় অপরাধীরা প্রত্যেক যুগে যেসব ধূর্তামী ও চালবাজীর আশ্রয় নিয়ে এসেছে এ প্রায় সে একই ধরনের চালবাজী ছিল। তারা জনগণকে খেলা-তামাশা ও নাচগানে (কালচার) মশগুল করতে থাকে। এভাবে তাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার প্রতি নজর দেবার চেতনাই থাকে না এবং এ অস্তিত্ব জগতের মধ্যে তারা একথা অনুভবই করতে পারে না যে, তাদেরকে এক ভয়াবহ ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

লাহ্ওয়াল হাদীসের এ ব্যাখ্যাই বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবেঈ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে (রা) জিজ্ঞেস করা হয়, এ আয়াতে যে লাহ্ওয়াল হাদীস শব্দ এসেছে এর তাৎপর্য কি? তিনি তিনবার জোর দিয়ে বলেন, هو والله الغناء "আল্লাহর কসম এর অর্থ হচ্ছে গান।" (ইবনে জারীর, ইবনে আবি শাইবাহ, হাকেম, বায়হাকী) প্রায় এ একই ধরনের উক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, মুজাহিদ, ইকরামাহ, সাঈদ ইবনে জুবাইর, হাসান বাসরী ও মাকহূল থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। ইবনে জারীর, ইবনে আবি হাতেম ও তিরমিযি হযরত আবু উমামাহ বাহেলীর (রা) হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤ هن ولا التجارة فيهن ولا اثما نهن

"গায়িকা মেয়েদের কেনাবেচা ও তাদের ব্যবসায় করা হালাল নয় এবং তাদের দাম নেয়াও হালাল নয়।"

অন্য একটি হাদীসে শেষ বাক্যটির শব্দাবলী হচ্ছে ঃ اكل ثمنهن حرام "তাদের মূল্য খাওয়া হারাম।" অন্য একটি হাদীসে একই আবু উমামাহ থেকে নিম্নোক্ত শব্দাবলী উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

لا يحل تعليم المغنيات ولا بيعهن ولا شراؤ هن وثمنهن حرام

"বাঁদীদেরকে গান–বাজনা করার শিক্ষা দেয়া এবং তাদের বেচা-কেনা করা হালাল নয় এবং তাদের দাম হারাম।"

এ তিনটি হাদীসে একথা সুস্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, من يشترى لهو الحديث আয়াতটি এ ব্যাপারেই নাযিল হয়। কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবী 'আহকামুল কুরআনে' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ও ইমাম মালেকের বরাত দিয়ে হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

من جلس الى قينة يسمع منها صب فى اذنيه الانك يوم القيمة

"যে ব্যক্তি গায়িকা বাঁদীর মাহফিলে বসে তার গান শুনবে, কিয়ামতের দিন তার কানে গরম শীসা ঢেলে দেয়া হবে।"

(এ প্রসংগে একথা জেনে নেয়া উচিত যে, সে যুগে গান–বাজনার "সংস্কৃতি" বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বরং পুরোপুরি বাঁদীদের বদৌলতেই জীবিত ছিল। স্বাধীন ও সম্ভ্রান্ত মেয়েরা সেকালে "আর্টিষ্ট" হননি। তাই নবী (সা) গায়িকাদের কেনা–বেচার কথা বলেছেন, দাম শব্দের সাহায্যে তাদের "ফী"র ধারণা দিয়েছেন এবং গায়িকা মেয়েদের জন্য "কাইনা" শব্দ ব্যবহার করেছেন। আরবী ভাষায় বাঁদীদের জন্য এ শব্দটি বলা হয়।)

৭. "জ্ঞান ছাড়াই" শব্দের সম্পর্ক "কিনে আনে" এর সাথেও হতে পারে আবার "বিচ্যুত করে" –এর সাথেও হতে পারে। যদি প্রথম বাক্যাংশের সাথে এর সম্পর্ক মেনে নেয়া হয়, তাহলে এর অর্থ হবে, সেই মূর্খ অজ্ঞ লোক এই মনোমুগ্ধকর জিনিসটি কিনে নেয় এবং সে জানে না কেমন মূল্যবান জিনিস বাদ দিয়ে সে কেমন ধ্বংসকর জিনিস কিনে নিচ্ছে। একদিকে আছে জ্ঞান ও সঠিক পথনির্দেশনা সমৃদ্ধ আল্লাহর আয়াত। বিনামূল্যে সে তা লাভ করছে কিন্তু তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। অন্যদিকে রয়েছে সব অর্থহীন ও বাজে জিনিস। সেগুলো চিন্তা ও চরিত্রশক্তি ধ্বংস করে দেয়। নিজের টাকা পয়সা খরচ করে সে সেগুলো লাভ করছে। আর যদি একে দ্বিতীয় বাক্যাংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত মনে করা হয়, তাহলে এর অর্থ হবে যে, সে জ্ঞান ছাড়াই লোকদের পথ দেখাচ্ছে এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করে সে যে নিজের ঘাড়ে কত বড় জুলুমের দায়ভাগ চাপিয়ে নিচ্ছে, তা সে জানে না।

৮. অর্থাৎ এ ব্যক্তি লোকদেরকে কিস্‌সা–কাহিনী ও গান–বাজনায় মশগুল করে আল্লাহর আয়াতের প্রতি বিদ্রূপ করতে চায়। সে কুরআনের এ দাওয়াতকে ঠাট্টা–তামাশার মধ্যে উড়িয়ে দিতে চায়। আল্লাহর দীনের সাথে লড়াই করার জন্য সে যুদ্ধের এমনসব নকশা তৈরি করতে চায় যেখানে একদিকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর আয়াত শোনাতে বের হবেন, অন্যদিকে কোন সুশ্রী ও সুকণ্ঠী গায়িকার মাহফিল গুলজার হতে থাকবে, আবার কোথাও কোন বাচাল কথক ইরান–তূরানের কাহিনী শুনাতে থাকবে এবং লোকেরা এসব সাংস্কৃতিক তৎপরতায় আকণ্ঠ ডুবে গিয়ে আল্লাহ, আখেরাত ও নৈতিক চরিত্রনীতির কথা শোনার মুডই হারিয়ে ফেলবে।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ؕ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ⑩ هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ⑪

তিনি[১২] আকাশসমূহ সৃষ্টি করেছেন স্তম্ভ ছাড়াই, যা তোমরা দেখতে পাও।[১৩] তিনি পৃথিবীতে পাহাড় গেড়ে দিয়েছেন, যাতে তা তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে।[১৪] তিনি সব ধরনের জীব-জন্তু পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি এবং জমিতে নানা ধরনের উত্তম জিনিস উৎপন্ন করি। এতো হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি, এখন আমাকে একটু দেখাও তো দেখি অন্যেরা কি সৃষ্টি করেছে?[১৫]—আসল কথা হচ্ছে এ জালেমরা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছে।[১৬]

৯. এ শাস্তি তাদের অপরাধের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই নির্ধারিত। তারা আল্লাহর দীন, তাঁর আয়াত ও তাঁর রসূলকে লাঞ্ছিত করতে চায়। এর বদলায় আল্লাহ তাকে কঠিন লাঞ্ছনাকর আযাব দেবেন।

১০. তাদের জন্য জান্নাতের নিয়ামতসমূহ রয়েছে, একথা বলেননি। বরং বলেছেন, তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত। যদি প্রথম কথাটি বলা হতো, তাহলে এর অর্থ হতো, তারা এ নিয়ামতসমূহ উপভোগ করবে ঠিকই কিন্তু এ জান্নাতগুলো তাদের নিজেদের হবে না। এর পরিবর্তে "তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতসমূহ" একথা বলায় আপনা-আপনি একথা প্রকাশ হয়ে গেছে যে, জান্নাত পুরোটাই তাদের হাওয়ালা করে দেয়া হবে এবং তারা তার নিয়ামতসমূহ এমনভাবে ভোগ করতে থাকবে যেমন একজন মালিক তার মালিকানাধীন জিনিস ভোগ করে থাকে। মালিকানা অধিকার ছাড়াই কাউকে কোন জিনিস থেকে নিছক লাভবান হবার সুযোগ দিলে যেভাবে তা ভোগ করা হয় সেভাবে নয়।

১১. অর্থাৎ নিজের প্রতিশ্রুতি পালন থেকে কোন জিনিসই তাঁকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না এবং তিনি যা কিছু করেন ঠিকমতো জ্ঞান ও ন্যায়পরায়ণতার দাবী অনুযায়ীই করেন। "এটা আল্লাহর অকাট্য প্রতিশ্রুতি"—একথা বলার পর আল্লাহর উপরোক্ত দু'টি বিশেষ গুণের কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, একথা বলা যে, মহান আল্লাহ ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না এবং এ বিশ্ব-জাহানে এমন কোন শক্তিই নেই যে তাঁর প্রতিশ্রুতি পালনের ব্যাপারে তাঁর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই ঈমান ও সৎকাজের বিনিময়ে আল্লাহ যা কিছু দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা কারো না পাওয়ার আশংকা নেই। তা ছাড়া আল্লাহর পক্ষ থেকে এ পুরস্কারের ঘোষণা পুরোপুরি তাঁর জ্ঞান ও ন্যায়পরায়ণতার

ওপর নির্ভরশীল। সেখানে হকদারকে বঞ্চিত করে নাহকদারকে দান করার কোন কারবার নেই। প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল লোকেরাই এ পুরস্কারের হকদার এবং আল্লাহ এ পুরস্কার তাদেরকেই দেবেন।

১২. ওপরের প্রস্তাবনা ও প্রারম্ভিক বাক্যগুলোর পর এখন আসল বক্তব্য অর্থাৎ শিরক খণ্ডন করে তাওহীদের দাওয়াত দেবার জন্য বক্তব্য পেশ করা হচ্ছে।

১৩. মূল শব্দ হচ্ছে, بغير عمد ترونها এর দু'টি মানে হতে পারে। একটি হচ্ছে, "তোমরা নিজেরাই দেখছো, স্তম্ভ ছাড়াই তা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।" দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, "এমন সব স্তম্ভের ওপর সেগুলো প্রতিষ্ঠিত যা চোখে দেখা যায় না" ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ এর দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করেছেন। আবার মুফাস্‌সিরগণের অন্য একটি দল এর প্রথম অর্থটি নেন। বর্তমান যুগের পদার্থ বিদ্যার দৃষ্টিতে যদি এর অর্থ বর্ণনা করা হয় তাহলে বলা যেতে পারে, সমগ্র আকাশ জগতে এ সীমা–সংখ্যাহীন বিশাল গ্রহ–নক্ষত্রপুঞ্জকে যার যার গতিপথে অদৃশ্য স্তম্ভের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। কোন তারের সাহায্যে তাদের পরস্পরকে সংযুক্ত করে রাখা হয়নি। কোন পেরেকের সাহায্যে তাদের একটির অন্যটির ওপর উল্টে পড়ে যাওয়াকে ঠেকিয়ে রাখা হয়নি। একমাত্র মাধ্যাকর্ষণ শক্তিই এ ব্যবস্থাকে সচল রেখেছে। আমাদের আজকের জ্ঞানের ভিত্তিতে এটিই আমাদের ব্যাখ্যা। হতে পারে আগামীকাল আমাদের জ্ঞান আরো কিছু বেড়ে যেতে পারে। তখন এর আরো কোন বেশী মানানসই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

১৪. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন্‌ নাহ্‌ল, ১২ টীকা।

১৫. অর্থাৎ যেসব সত্ত্বাকে তোমরা নিজেদের উপাস্য করে নিয়েছো, যাদেরকে তোমরা নিজেদের ভাগ্যবিধাতা করে নিয়েছো এবং যাদের বন্দেগী ও পূজা করার জন্য তোমরা এত হন্যে হয়ে লেগেছো।

১৬. অর্থাৎ যখন এরা এ বিশ্ব–জাহানে আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোন সৃষ্টি চিহ্নিত করতে পারেনি এবং একথা সুস্পষ্ট যে, তারা তা করতে পারে না তখন তাদের যারা স্রষ্টা নয় এমন সত্ত্বাকে আল্লাহর একচ্ছত্র ও সার্বভৌম কর্তৃত্বে শরীক করা, তাদের সামনে আনুগত্যের শির নত করা এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করা ও অভাব মোচন করার জন্য আবেদন জানানোকে সুস্পষ্ট নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে। যতক্ষণ কোন ব্যক্তি একেবারেই উন্মাদ হয়ে না যায় ততক্ষণ সে এত বড় নির্বুদ্ধিতা করতে পারে না যে, সে কারো সামনে নিজেই নিজের উপাস্যদেরকে সৃষ্টিকর্মে অক্ষম বলে এবং একমাত্র আল্লাহকে স্রষ্টা বলে স্বীকার করে নেবার পরও তাদেরকে উপাস্য বলে মেনে নেবার জন্য জিদ ধরবে। যার ঘটে একটুখানিও বুদ্ধি আছে সে কখনো চিন্তা করবে না, কোন জিনিস সৃষ্টি করার ক্ষমতাই যার নেই এবং পৃথিবী ও আকাশের কোন জিনিসের সৃষ্টিতে যার নামমাত্র অংশও নেই সে কেন আমাদের উপাস্য হবে? কেন আমরা তার সামনে সিজদানত হবো? অথবা তার পদচুম্বন করবো এবং তার আস্তানায় গিয়ে ষষ্ঠাংগ প্রণিপাত করবো? আমাদের ফরিয়াদ শোনার এবং আমাদের অভাব পূরণ করার কী ক্ষমতা তার আছে? তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম, সে আমাদের প্রার্থনা শুনছে কিন্তু তার জবাবে সে নিজে কি পদক্ষেপ নিতে পারে, যখন তার নিজের কিছু করার ক্ষমতা নেই?

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿١٢﴾ وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴿١٣﴾

২ রুকূ'

আমি[১৭] লুকমানকে দান করেছিলাম সূক্ষ্মজ্ঞান। যাতে সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়।[১৮] যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে তার কৃতজ্ঞতা হবে তার নিজেরই জন্য লাভজনক। আর যে ব্যক্তি কুফরী করবে, সে ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ অমুখাপেক্ষী এবং নিজে নিজেই প্রশংসিত।[১৯]

স্মরণ করো যখন লুকমান নিজের ছেলেকে উপদেশ দিচ্ছিল, সে বললো, "হে পুত্র! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না।[২০] যথার্থই শিরক অনেক বড় জুলুম।"[২১]

যে কিছু করতে পারে সে-ই তো কিছু ভেঙ্গে যাওয়া জিনিস গড়তে পারে কিন্তু যার আদতে করারই কোন ক্ষমতা নেই সে আবার কেমন করে ভেঙে যাওয়া জিনিস গড়তে পারবে।

১৭. একটি শক্তিশালী বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির মাধ্যমে শিরকের অসারতা প্রমাণ করার পর এখন আরবের লোকদেরকে একথা জানানো হচ্ছে যে, এ যুক্তিসংগত কথা প্রথমবার তোমাদের সামনে তোলা হচ্ছে না বরং পূর্বেও বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীরা একথাই বলে এসেছেন এবং তোমাদের নিজেদের বিখ্যাত জ্ঞানী লুকমান আজ থেকে বহুকাল আগে একথাই বলে গেছেন। তাই শিরক যদি কোন অযৌক্তিক বিশ্বাস হয়ে থাকে তাহলে ইতিপূর্বে কেউ একথা বলেনি কেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের জবাবে তোমরা একথা বলতে পারো না।

একজন বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী হিসেবে আরবে লুকমান বহুল পরিচিত ব্যক্তিত্ব। জাহেলী যুগের কবিরা যেমন ইমরাউল কায়েস, লবীদ, আ'শা, তারাফাহ প্রমুখ তাদের কবিতায় তার কথা বলা হয়েছে। আরবের কোন কোন লেখাপড়া জানা লোকের কাছে "সহীফা লুকমান" নামে তাঁর জ্ঞানগর্ভ উক্তির একটি সংকলন পাওয়া যেতো। হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, হিজরাতের তিন বছর পূর্বে মদীনার সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতে প্রভাবিত হন তিনি ছিলেন সুওয়াইদ ইবনে সামেত। তিনি হজ্জ সম্পাদন করার জন্য মক্কায় যান। সেখানে নবী করীম (সা) নিজের নিয়ম মতো বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত হাজীদের আবাসস্থলে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেককে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। এ প্রসংগে সুওয়াইদ যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তৃতা শুনেন, তাঁকে বলেন, আপনি যে ধরনের কথা বলছেন তেমনি ধরনের একটি

জিনিস আমার কাছেও আছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, সেটা কি? জবাব দেন সেটা লুকমানের পুস্তিকা। তারপর নবী করীমের (সা) অনুরোধে তিনি তার কিছু অংশ পাঠ করে তাঁকে শুনান। তিনি বলেন, এটা বড়ই চমৎকার কথা। তবে আমার কাছে এর চেয়েও বেশী চমৎকার কথা আছে। এরপর কুরআন শুনান। কুরআন শুনে সুওয়াইদ অবশ্যই স্বীকার করেন, নিসন্দেহে এটা লুকমানের পুস্তিকার চেয়ে ভালো। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২ খণ্ড, ৬৭-৬৯ পৃঃ; উসুদুল গাবাহ, ২ খণ্ড, ৩৭৮ পৃষ্ঠা) ঐতিহাসিকগণ বলেন, এই সুওয়াইদ ইবনে সামেত তাঁর যোগ্যতা, বীরত্ব, সাহিত্য ও কাব্য মনীষা এবং বংশ মর্যাদার কারণে মদীনায় "কামেল" নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাতের পর যখন তিনি মদীনায় ফিরে যান তার কিছুদিন পর বুয়াসের যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং তাতে তিনি মারা যান। তাঁর গোত্রের লোকদের সাধারণভাবে এ ধারণা ছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাতের পর তিনি মুসলমান হয়ে যান।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে লুকমানের ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে ব্যাপক মতবিরোধ দেখা যায়। জাহেলিয়াতের অন্ধকার যুগে কোন লিখিত ইতিহাসের অস্তিত্ব ছিল না। শত শত বছর থেকে মুখে মুখে শ্রুত যেসব তথ্য স্মৃতির ভাণ্ডারে লোককাহিনী-গল্প-গাথার আকারে সংগৃহীত হয়ে আসছিল সেগুলোর ওপর ছিল এর ভিত্তি। এসব বর্ণনার প্রেক্ষিতে কেউ কেউ হযরত লুকমানকে আদ জাতির অন্তরভুক্ত ইয়ামনের বাদশাহ মনে করতো। মাওলানা সাইয়েদ সুলাইমান নদবী এসব বর্ণনার ওপর নির্ভর করে তাঁর 'আরদুল কুরআন' গ্রন্থে এ মত প্রকাশ করেছেন যে, আদ জাতির ওপর আল্লাহর আযাব নাযিল হবার পর হযরত হূদের (আ) সাথে তাদের যে ঈমানদার অংশটি বেঁচে গিয়েছিল লুকমান ছিলেন তাঁদেরই বংশোদ্ভূত। ইয়ামনে এ জাতির যে শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তিনি ছিলেন তার অন্যতম শাসক ও বাদশাহ। কিন্তু কতিপয় প্রবীণ সাহাবী ও তাবেঈদের মাধ্যমে প্রাপ্ত অন্য বর্ণনাগুলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, লুকমান ছিলেন একজন হাবশী গোলাম। হযরত আবু হুরাইরা (রা), মুজাহিদ, ইকরিমাহ ও খালেদুর রাব'ঈও একথাই বলেন। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী (রা) বলেন, তিনি ছিলেন নূবার অধিবাসী। সাঈদ ইবনে মুসাইয়েবের উক্তি হচ্ছে, তিনি মিসরের কালো লোকদের অন্তরভুক্ত ছিলেন। এ তিনটি বক্তব্য প্রায় কাছাকাছি অবস্থান করছে। কারণ আরবের লোকেরা কালো বর্ণের মানুষদেরকে সেকালে প্রায়ই হাবশী বলতো। আর নূবা হচ্ছে মিসরের দক্ষিণে এবং সূদানের উত্তরে অবস্থিত একটি এলাকা। তাই তিনটি উক্তিতে একই ব্যক্তিকে নূবী, মিসরীয় ও হাবশী বলা কেবলমাত্র শাব্দিক বিরোধ ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থের দিক দিয়ে এখানে কোন বিরোধ নেই। তারপর রওদাতুল আনাফে সুহাইলির ও মুরূজুয যাহাবে মাস'উদীর বর্ণনা থেকে এ সূদানী গোলামের কথা আরবে কেমন করে ছড়িয়ে পড়লো এ প্রশ্নের ওপরও আলোকপাত হয়। এ উভয় বর্ণনায় বলা হয়েছে, এ ব্যক্তি আসলে ছিলেন নূবী। কিন্তু তিনি বাসিন্দা ছিলেন মাদ্‌য়ান ও আইল (বর্তমান আকাবাহ) এলাকার। এ কারণে তাঁর ভাষা ছিল আরবী এবং তাঁর জ্ঞানের কথা আরবে ছড়িয়ে পড়ে। তা ছাড়া সুহাইলী আরো বিস্তারিতভাবে বলেছেন যে, লুকমান হাকীম ও লুকমান ইবনে আদ দু'জন আলাদা ব্যক্তি। তাদেরকে এক ব্যক্তি মনে করা ঠিক নয়। (রওদুল আনাফ, ১ম খণ্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা এবং মাসউদী, ১ম খণ্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা)

এখানে একথাটিও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে দেয়া প্রয়োজন যে, প্রাচ্যবিদ ডিরেনবুর্গ (Derenbourg) প্যারিস লাইব্রেরীর যে আরবী পাণ্ডুলিপিটি "লুকমান হাকীমের গাথা" (Fables De Loqman Lo Sage) নামে প্রকাশ করেছেন সেটি আসলে বানোয়াট। "লুকমানের সহীফা''র সাথে তার দূরতম কোন সম্পর্কও নেই। ত্রয়োদশ ঈসায়ী শতকে এ গাথাগুলো কেউ সংকলন করেছিলেন। তাঁর আরবী সংস্করণ বড়ই ত্রুটিপূর্ণ। সেগুলো পড়লে পরিষ্কার অনুভব করা যাবে যে, আসলে অন্যকোন ভাষা থেকে অনুবাদ করে গ্রন্থকার নিজের পক্ষ থেকে সেগুলোর সম্পর্ক লুকমান হাকীমের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। প্রাচ্যবিদরা এ ধরনের জাল ও বানোয়াট জিনিসগুলো বের করে যে উদ্দেশ্যে সামনে আনেন তা এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, কুরআন বর্ণিত কাহিনীগুলোকে যে কোনভাবেই অনৈতিহাসিক কাহিনী প্রমাণ করে অনির্ভরযোগ্য গণ্য করা। যে ব্যক্তিই ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলামে "লুকমান" শিরোনামে (B. Heller) হেলারের নিবন্ধটি পড়বেন তাঁর কাছেই তাদের মনোভাব অস্পষ্ট থাকবে না।

১৮. অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত এ জ্ঞান ও অন্তরদৃষ্টির প্রাথমিক চাহিদা এই ছিল যে, মানুষ তার রবের মোকাবিলায় কৃতজ্ঞ ও অনুগৃহীত হবার নীতি অবলম্বন করবে, অনুগ্রহ অস্বীকার করার ও বিশ্বাসঘাতকতার নীতি অবলম্বন করবে না। আর তার কৃতজ্ঞতা নিছক মৌখিক হিসেব-নিকেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং চিন্তা, কথা ও কাজ তিন পর্যায়েই পরিব্যাপ্ত হবে। আমি যা কিছু লাভ করেছি সবই আল্লাহর দান, নিজের হৃদয় ও মস্তিষ্কের গভীরে তার এ বিশ্বাস ও চেতনাও সঞ্চারিত হবে। তার কণ্ঠে সদা সর্বদা আল্লাহর অনুগ্রহের স্বীকৃতিও উচ্চারিত হবে। কার্যক্ষেত্রেও সে আল্লাহর হুকুম মেনে চলে, তাঁর হুকুম অমান্য করা থেকে দূরে থেকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য প্রচেষ্টা ও সাধনা করতে থেকে, তাঁর দেয়া নিয়ামতসমূহ তাঁর বান্দাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে একথা প্রমাণ করে দেবে যে, প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুগৃহীত।

১৯. অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুফরী করে তার কুফরী তার নিজের জন্য ক্ষতিকর। এতে আল্লাহর কোন ক্ষতি হয় না। তিনি অমুখাপেক্ষী। কারো কৃতজ্ঞতার মুখাপেক্ষী নন। কারো কৃতজ্ঞতা তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বে কোন বৃদ্ধি ঘটায় না। বান্দার যাবতীয় নিয়ামত যে একমাত্র তাঁরই দান কারো অকৃতজ্ঞতা ও কুফরী এ জাজ্জ্বল্যমান সত্যে কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। কেউ তাঁর প্রশংসা করুক বা নাই করুক তিনি আপনা আপনিই প্রশংসিত। বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি অণু-কণিকা তাঁর পূর্ণতা ও সৌন্দর্য এবং তাঁর স্রষ্টা ও অন্নদাতা হবার সাক্ষ দিচ্ছে এবং প্রত্যেকটি সৃষ্ট বস্তু নিজের সমগ্র সত্তা দিয়ে তাঁর প্রশংসা গেয়ে চলছে।

২০. লুকমানের পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপদেশমালা থেকে এ বিশেষ উপদেশ বাণীটিকে এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে দু'টি বিশেষ সম্পর্কের ভিত্তিতে। এক, তিনি নিজ পুত্রকে এ উপদেশটি দেন। আর একথা সুস্পষ্ট, মানুষ যদি দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশী কারো ব্যাপারে আন্তরিক হতে পারে তাহলে সে হচ্ছে তার নিজের সন্তান। এক ব্যক্তি অন্যকে ধোঁকা দিতে পারে, তার সাথে মুনাফিকী আচরণ করতে পারে কিন্তু সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রকৃতির লোকটিও নিজ পুত্রকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা কখনই করতে পারে না। তাই লুকমানের তার নিজ পুত্রকে এ

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ⑭

—আর[২২] প্রকৃতপক্ষে আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার হক চিনে নেবার জন্য নিজেই তাকিদ করেছি। তার মা দুর্বলতার পর দুর্বলতা সহ্য করে তাকে নিজের গর্ভে ধারণ করে এবং দু'বছর লাগে তার দুধ ছাড়তে।[২৩] (এ জন্য আমি তাকে উপদেশ দিয়েছি) আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং নিজের পিতা-মাতার প্রতিও, আমার দিকেই তোমাকে ফিরে আসতে হবে।

নসীহত করা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, তাঁর মতে শিরক যথার্থই একটি নিকৃষ্ট কাজ এবং এ জন্যই তিনি সর্বপ্রথম নিজের প্রাণাধিক পুত্রকে এ গোমরাহীটি থেকে দূরে থাকার উপদেশ দেন। দুই, মক্কার কাফেরদের অনেক পিতা-মাতা সে সময় নিজের সন্তানদেরকে শিরকী ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাওহীদের দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার জন্য বাধ্য করছিল। সামনের দিকের একথা বর্ণনা করা হয়েছে। তাই সেই অজ্ঞদেরকে শুনানো হচ্ছে, তোমাদের দেশেরই বহুল পরিচিত জ্ঞানী পণ্ডিত তো তাঁর নিজের পুত্রের মংগল করার দায়িত্বটা তাকে শিরক থেকে দূরে থাকার নসিহত করার মাধ্যমেই পালন করেন। এখন তোমরা যে তোমাদের সন্তানদেরকে শিরক করতে বাধ্য করছো, এটা কি তাদের প্রতি শুভেচ্ছা না তাদের অমংগল কামনা?

২১. জুলুমের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, কারো অধিকার হরণ করা এবং ইনসাফ বিরোধী কাজ করা। শিরক এ জন্য বৃহত্তর জুলুম যে, মানুষ এমন সব সত্তাকে তার নিজের স্রষ্টা, রিযিকদাতা ও নিয়ামতদানকারী হিসেবে বরণ করে নেয়, তার সৃষ্টিতে যাদের কোন অংশ নেই তাকে রিযিক দান করার ক্ষেত্রে যাদের কোন দখল নেই এবং মানুষ এ দুনিয়ায় যেসব নিয়ামত লাভে ধন্য হচ্ছে সেগুলো প্রদান করার ব্যাপারে যাদের কোন ভূমিকাই নেই। এটা এত বড় অন্যায়, যার চেয়ে বড় কোন অন্যায়ের কথা চিন্তাই করা যায় না। তারপর মানুষ একমাত্র তার স্রষ্টারই বন্দেগী ও পূজা-অর্চনা করবে, এটা মানুষের ওপর তার স্রষ্টার অধিকার। কিন্তু সে অন্যের বন্দেগী ও পূজা-অর্চনা করে তাঁর অধিকার হরণ করে। তারপর স্রষ্টা ছাড়া অন্য সত্তার বন্দেগী ও পূজা করতে গিয়ে মানুষ যে কাজই করে তাতে সে নিজের দেহ ও মন থেকে শুরু করে পৃথিবী ও আকাশের বহু জিনিস ব্যবহার করে। অথচ এ সমস্ত জিনিস এক লা-শরীক আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন এবং এর মধ্যে কোন জিনিসকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বন্দেগীতে ব্যবহার করার অধিকার তার নেই। তারপর মানুষ নিজেকে লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগের মধ্যে ঠেলে দেবে না, তার নিজের ওপর এ অধিকার রয়েছে। কিন্তু সে স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির বন্দেগী করে নিজেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিতও করে এবং এই সংগে শাস্তির যোগ্যও বানায়। এভাবে একজন মুশরিকের সমগ্র জীবন একটি সর্বমুখী ও সার্বক্ষণিক জুলুমে পরিণত হয়। তার কোন একটি মুহূর্তও জুলুমমুক্ত নয়।

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ⑮

কিন্তু যদি তারা তোমার প্রতি আমার সাথে এমন কাউকে শরীক করার জন্য চাপ দেয় যাকে তুমি জানো না,[২৪] তাহলে তুমি তাদের কথা কখনোই মেনে নিয়ো না। দুনিয়ায় তাদের সাথে সদাচার করতে থাকো কিন্তু মেনে চলো সে ব্যক্তির পথ যে আমার দিকে ফিরে এসেছে। তারপর তোমাদের সবাইকে ফিরে আসতে হবে আমারই দিকে।[২৫] সে সময় তোমরা কেমন কাজ করছিলে তা আমি তোমাদের জানিয়ে দেবো।[২৬]

২২. এখান থেকে প্যারার শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৪ ও ১৫ আয়াত দু'টি প্রসংগক্রমে বলা হয়েছে। আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে লুকমানের উক্তির অতিরিক্ত ব্যাখ্যা হিসেবে একথা বলেছেন।

২৩. এ শব্দগুলো থেকে ইমাম শাফে'ঈ (র), ইমাম আহমাদ (র), ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) এ অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, শিশুর দুধ পান করার মেয়াদ ২ বছরে পূর্ণ হয়ে যায়। এ মেয়াদকালে কোন শিশু যদি কোন স্ত্রীলোকের দুধপান করে তাহলে দুধ পান করার "হুরমাত" (অর্থাৎ দুধপান করার কারণে স্ত্রীলোকটি তার মায়ের মর্যাদায় উন্নীত হয়ে যাওয়া এবং তার জন্য তার সাথে বিবাহ হারাম হয়ে যাওয়া) প্রমাণিত হয়ে যাবে। অন্যথায় পরবর্তীকালে কোন প্রকার দুধ পান করার ফলে কোন "হুরমাত" প্রতিষ্ঠিত হবে না। এ উক্তির স্বপক্ষে ইমাম মালেকেরও একটি বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র) অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করার উদ্দেশ্যে এ মেয়াদকে বাড়িয়ে আড়াই বছর করার অভিমত ব্যক্ত করেন। এই সংগে ইমাম সাহেব একথাও বলেন, যদি দু'বছর বা এর চেয়ে কম সময়ে শিশুর দুধ ছাড়িয়ে দেয়া হয় এবং খাদ্যের ব্যাপারে শিশু কেবল দুধের ওপর নির্ভরশীল না থাকে, তাহলে এরপর কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করার ফলে কোন দুধপান জনিত হুরমাত প্রমাণিত হবে না। তবে যদি শিশুর আসল খাদ্য দুধই হয়ে থাকে তাহলে অন্যান্য খাদ্য কম বেশী কিছু খেয়ে নিলেও এ সময়ের মধ্যে দুধ পানের কারণে হুরমাত প্রমাণিত হয়ে যাবে। কারণ শিশুকে অপরিহার্যভাবে দু'বছরেই দুধপান করাতে হবে, আয়াতের উদ্দেশ্য এটা নয়। সূরা বাকারায় বলা হয়েছে,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

"মায়েরা শিশুদেরকে পুরো দু'বছর দুধ পান করাবে, তার জন্য যে দুধপান করার মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়।" (২৩৩ আয়াত)

يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿١٦﴾ يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٧﴾

(আর লুকমান[২৭] বলেছিল) "হে পুত্র! কোন জিনিস যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা লুকিয়ে থাকে পাথরের মধ্যে, আকাশে বা পৃথিবীতে কোথাও, তাহলে আল্লাহ তা বের করে নিয়ে আসবেন।[২৮] তিনি সূক্ষ্মদর্শী এবং সবকিছু জানেন। হে পুত্র! নামায কায়েম করো, সৎকাজের হুকুম দাও, খারাপ কাজে নিষেধ করো এবং যা কিছু বিপদই আসুক সে জন্য সবর করো।[২৯] একথাগুলোর জন্য বড়ই তাকিদ করা হয়েছে।[৩০]

ইবনে আব্বাস (রা) এ শব্দগুলো থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌছেছেন এবং উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে তাঁর সাথে একমত হয়েছেন যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন মেয়াদ ছ'মাস। কারণ কুরআনের অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে, وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا "তার পেটের মধ্যে অবস্থান করা ও দুধ ছেড়ে দেয়ার কাজ হয় ৩০ মাসে।" (আল আহকাফ, আয়াত ১৫) এটি একটি সূক্ষ্ম আইনগত বিধান এবং এর ফলে বৈধ ও অবৈধ গর্ভের অনেক বিতর্কের অবসান ঘটে।

২৪. অর্থাৎ তোমার জানা মতে যে আমার সাথে শরীক নয়।

২৫. অর্থাৎ সন্তান ও পিতা–মাতা সবাইকে।

২৬. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আনকাবূত, ১১ ও ১২ টীকা।

২৭. লুকমানের অন্যান্য উপদেশমালার উল্লেখ এখানে একথা বলার জন্য করা হচ্ছে যে, আকীদা–বিশ্বাসের মতো নৈতিকতার যে শিক্ষা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেশ করছেন তাও আরবে নতুন ও অজানা কথা নয়।

২৮. অর্থাৎ আল্লাহর জ্ঞান ও তাঁর পাকড়াও–এর বাইরে কেউ যেতে পারে না। পাথরের মধ্যে ছোট্ট একটি কণা তোমার দৃষ্টির অগোচরে থাকতে পারে কিন্তু তাঁর কাছে তা সুস্পষ্ট। আকাশ মণ্ডলে একটি ক্ষুদ্রতম কণিকা তোমার থেকে বহু দূরবর্তী হতে পারে কিন্তু তা আল্লাহর বহু নিকটতর। ভূমির বহু নিম্ন স্তরে পতিত কোন জিনিস তোমার কাছে গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। কিন্তু তাঁর কাছে তা রয়েছে উজ্জ্বল আলোর মধ্যে। কাজেই তুমি কোথাও কোন অবস্থায়ও এমন কোন সৎ বা অসৎ কাজ করতে পারো না যা আল্লাহর অগোচরে থেকে যায়। তিনি কেবল তা জানেন তাই নয় বরং যখন হিসেব–নিকেশের

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

আর মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা বলো না,[৩১] পৃথিবীর বুকে চলো না উদ্ধত ভংগীতে, আল্লাহ পছন্দ করেন না আত্মম্ভরী ও অহংকারীকে।[৩২] নিজের চলনে ভারসাম্য আনো[৩৩] এবং নিজের আওয়াজ নীচু করো। সব আওয়াজের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে গাধার আওয়াজ।[৩৪]

সময় আসবে তখন তিনি তোমাদের প্রত্যেকটি কাজের ও নড়াচড়ার রেকর্ড সামনে নিয়ে আসবেন।

২৯. এর মধ্যে এদিকে একটি সূক্ষ্ম ইংগিত রয়েছে যে, সৎকাজের হুকুম দেয়া এবং অসৎকাজে নিষেধ করার দায়িত্ব যে ব্যক্তিই পালন করবে তাকে অনিবার্যভাবে বিপদ আপদের মুখোমুখি হতে হবে।. এ ধরনের লোকের পেছনে দুনিয়া কোমর বেঁধে লেগে যাবে এবং সব ধরনের কষ্টের সম্মুখীন তাকে হতেই হবে।

৩০. এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, এটি বড়ই হিম্মতের কাজ। মানবতার সংশোধন এবং তার সংকট উত্তরণে সাহায্য করার কাজ কম হিম্মতের অধিকারী লোকদের পক্ষে সম্ভব নয়। এসব কাজ করার জন্য শক্ত বুকের পাটা দরকার।

৩১. মূল শব্দগুলো হচ্ছে لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ "সা'আর" বলা হয় আরবী ভাষায় একটি রোগকে। এ রোগটি হয় উটের ঘাড়ে। এ রোগের কারণে উট তার ঘাড় সবসময় একদিকে ফিরিয়ে রাখে। এ থেকেই فلان صعر خده "অমুক ব্যক্তি উটের মতো তার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।" অর্থাৎ অহংকারপূর্ণ ব্যবহার করলো এবং মুখ ফিরিয়ে কথা বললো। এ ব্যাপারেই তাগ্‌লাব গোত্রের কবি আমর ইবনে হাই বলেন ঃ

وكنا اذا الجبار صعر خده

اقمنا له من ميله فتقوما

"আমরা এমন ছিলাম যখন কোন দাম্ভিক স্বৈরাচারী আমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা বললো তখন আমরা তার বক্রতার এমন দফারফা করলাম যে একেবারে সোজা হয়ে গেলো"

৩২. মূল শব্দগুলো হচ্ছে مختال ও فخور —'মুখতাল' মানে হচ্ছে, এমন ব্যক্তি যে নিজেই নিজেকে কোন বড় কিছু মনে করে। আর ফাখূর তাকে বলে, যে নিজের বড়াই করে অন্যের কাছে। মানুষের চালচলনে অহংকার, দম্ভ ও ঔদ্ধত্যের প্রকাশ তখনই

অনিবার্য হয়ে ওঠে, যখন তার মাথায় নিজের শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাস ঢুকে যায় এবং সে অন্যদেরকে নিজের বড়াই ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করাতে চায়।

৩৩. কোন কোন মুফাস্‌সির এর এই অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, "দ্রুতও চলো না এবং ধীরেও চলো না বরং মাঝারি চালে চলো।" কিন্তু পরবর্তী আলোচনা থেকে পরিষ্কার জানা যায়, এখানে ধীরে বা দ্রুত চলা আলোচ্য বিষয় নয়। ধীরে বা দ্রুত চলার মধ্যে কোন নৈতিক গুণ বা দোষ নেই এবং এ জন্য কোন নিয়মও বেঁধে দেয়া যায় না। কাউকে দ্রুত কোন কাজ করতে হলে সে দ্রুত ও জোরে চলবে না কেন। আর যদি নিছক বেড়াবার জন্য চলতে থাকে তাহলে এ ক্ষেত্রে ধীরে চলায় ক্ষতি কি? মাঝারি চালে চলার যদি কোন মানদণ্ড থেকেই থাকে, তাহলে প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাকে একটি সাধারণ নিয়মে পরিণত করা যায় কেমন করে? আসলে এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রবৃত্তির এমন অবস্থার সংশোধন যার প্রভাবে চলার মধ্যে দম্ভ অথবা দীনতার প্রকাশ ঘটে। বড়াই করার অহমিকা যদি ভেতরে থেকে যায় তাহলে অনিবার্যভাবে তা একটি বিশেষ ধরনের চাল–চলনের মাধ্যমে বের হয়ে আসে। এ অবস্থা দেখে লোকটি যে কেবল অহংকারে মত্ত হয়েছে, একথাই জানা যায় না, বরং তার চাল–চলনের রং ঢং তার অহংকারের স্বরূপটিও তুলে ধরে। ধন–দওলত, ক্ষমতা–কর্তৃত্ব, সৌন্দর্য, জ্ঞান, শক্তি এবং এ ধরনের অন্যান্য যতো জিনিসই মানুষের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি করে তার প্রত্যেকটির দম্ভ তার চাল–চলনে একটি বিশেষ ভংগী ফুটিয়ে তোলে। পক্ষান্তরে চাল–চলনে দীনতার প্রকাশ ও কোন না কোন দুষণীয় মানসিক অবস্থার প্রভাবজাত হয়ে থাকে। কখনো মানুষের মনের সুপ্ত অহংকার একটি লোক দেখানো বিনয় এবং কৃত্রিম দরবেশী ও আল্লাহ প্রেমিকের রূপ লাভ করে এবং এ জিনিসটি তার চাল–চলনে সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। আবার কখনো মানুষ যথার্থই দুনিয়া ও তার অবস্থার মোকাবিলায় পরাজিত হয় এবং নিজের চোখে নিজেই হেয় হয়ে দুর্বল চালে চলতে থাকে। লুকমানের উপদেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে, নিজের মনের এসব অবস্থার পরিবর্তন করো এবং একজন সোজা–সরল–যুক্তিসংগত ভদ্রলোকের মতো চলো, যেখানে নেই কোন অহংকার ও দম্ভ এবং কোন দুর্বলতা, লোক দেখানো বিনয় ও ত্যাগ।

এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের রুচি যে পর্যায়ের গড়ে উঠেছিল তা এ ঘটনাটি থেকেই অনুমান করা যেতে পারে। হযরত উমর (রা) একবার এক ব্যক্তিকে মাথা হেঁট করে চলতে দেখলেন। তিনি তাকে ডেকে বললেন, "মাথা উঁচু করে চলো। ইসলাম রোগী নয়।" আর একজনকে তিনি দেখলেন সে কুঁকড়ে চলছে। তিনি বললেন, "ওহে জালেম! আমাদের দীনকে মেরে ফেলছো কেন?" এ দু'টি ঘটনা থেকে জানা যায়, হযরত উমরের কাছে দীনদারির অর্থ মোটেই এটা ছিল না যে, পথ চলার সময় রোগীর মতো আচরণ করবে এবং অযথা নিজেকে দীনহীন করে মানুষের সামনে পেশ করবে। কোন মুসলমানকে এভাবে চলতে দেখে তাঁর ভয় হতো, এভাবে চললে অন্যদের সামনে ইসলামের ভুল প্রতিনিধিত্ব করা হবে এবং মুসলমানদের মধ্যেই নিস্তেজ ভাব সৃষ্টি হয়ে যাবে। এমনি ঘটনা হযরত আয়েশার (রা) ব্যাপারে একবার ঘটে। তিনি দেখলেন একজন লোক কুঁকড়ে মুকড়ে রোগীর মতো চলছে। জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? বলা হলো, ইনি একজন কারী (অর্থাৎ কুরআন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন এবং শিক্ষাদান ও ইবাদাত করার মধ্যে মশ্‌গুল থাকেন) একথা শুনে হযরত আয়েশা (রা) বললেন, "উমর ছিলেন

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ⑳

৩ রুকূ'

তোমরা কি দেখো না, আল্লাহ যমীন ও আসমানের সমস্ত জিনিস তোমাদের জন্য অনুগত ও বশীভূত করে রেখেছেন[৩৫] এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও গোপন নিয়ামতসমূহ[৩৬] সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন? এরপর অবস্থা হচ্ছে এই যে, মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে,[৩৭] তাদের নেই কোন প্রকার জ্ঞান, পথনির্দেশনা বা আলোক প্রদর্শনকারী কিতাব।[৩৮]

কারীদের নেতা। কিন্তু তাঁর অবস্থা ছিল, পথে চলার সময় জোরে জোরে হাঁটতেন। যখন কথা বলতেন, জোরে জোরে বলতেন। যখন মারধর করতেন খুব জোরেশোরে মারধর করতেন।" (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, বনী ইসরাঈল, ৪৩ টীকা এবং সূরা আল ফুরকান, ৭৯ টীকা।)

৩৪. এর মানে এ নয় যে, মানুষ সবসময় আস্তে নীচু স্বরে কথা বলবে এবং কখনো জোরে কথা বলবে না। বরং গাধার আওয়াজের সাথে তুলনা করে কোন্ ধরনের ভাব–ভঙ্গিমা ও কোন্ ধরনের আওয়াজে কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে তা পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয়েছে। ভংগী ও আওয়াজের এক ধরনের নিম্নগামিতা ও উচ্চগামিতা এবং কঠোরতা ও কোমলতা হয়ে থাকে স্বাভাবিক ও প্রকৃত প্রয়োজনের খাতিরে। যেমন কাছের বা কম সংখ্যক লোকের সাথে কথা বললে আস্তে ও নীচু স্বরে বলবেন। দূরের অথবা অনেক লোকের সাথে কথা বলতে হলে অবশ্যই জোরে বলতে হবে। উচ্চারণভংগীর ফারাকের ব্যাপারটাও এমনি স্থান–কালের সাথে জড়িত। প্রশংসা বাক্যের উচ্চারণভংগী নিন্দা বাক্যের উচ্চারণভংগী থেকে এবং সন্তোষ প্রকাশের কথার ঢং এবং অসন্তোষ প্রকাশের কথার ঢং বিভিন্ন হওয়াই উচিত। এ ব্যাপারটা কোন অবস্থায়ই আপত্তিকর নয়। হযরত লুকমানের নসীহতের অর্থ এ নয় যে, এ পার্থক্যটা উঠিয়ে দিয়ে মানুষ সবসময় একই ধরনের নীচু স্বরে ও কোমল ভংগীমায় কথা বলবে। আসলে আপত্তিকর বিষয়টি হচ্ছে অহংকার প্রকাশ, ভীতি প্রদর্শন এবং অন্যকে অপমানিত ও সন্ত্রস্ত করার জন্য গলা ফাটিয়ে গাধার মতো বিকট স্বরে কথা বলা।

৩৫. কোন জিনিসকে কারো জন্য অনুগত করে দেয়ার অর্থ হচ্ছে : এক, জিনিসটিকে তার অধীন ও ব্যবহারোপযোগী করে দেয়া হবে। তাকে যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় ও ব্যবহার করার ক্ষমতা তাকে দেয়া হবে। দুই, জিনিসটিকে কোন নিয়মের অধীন করে দেয়া হবে। ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য তা উপকারী ও লাভজনক হয়ে যাবে এবং এতে তার স্বার্থ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার আনুগত্য করো তখন তারা বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে যে রীতির ওপর পেয়েছি তার আনুগত্য করবো। শয়তান যদি তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনের দিকেও আহবান করতে থাকে তবুও কি তারা তারই আনুগত্য করবে?[৩৯]

উদ্ধার হবে। পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত জিনিসকে মহান আল্লাহ একই অর্থে মানুষের জন্য অনুগত করে দেননি। বরং কোন জিনিসকে প্রথম অর্থে এবং কোনটিকে দ্বিতীয় অর্থে অনুগত করে দিয়েছেন। যেমন পানি, মাটি, আগুন, উদ্ভিদ, খনিজ পদার্থ, গবাদি পশু ইত্যাদি আমাদের জন্য প্রথম অর্থে এবং চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদিকে দ্বিতীয় অর্থে আমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন।

৩৬. যেসব নিয়ামত কোন না কোনভাবে মানুষ অনুভব করে এবং তার জ্ঞানে ধরা দেয় সেগুলো প্রকাশ্য নিয়ামত। আর যেসব নিয়ামত মানুষ জানে না এবং অনুভবও করে না সেগুলো গোপন নিয়ামত। মানুষের নিজের শরীরে এবং তার বাইরে দুনিয়ায় তার স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে এমন অগণিত ও অসংখ্য জিনিস রয়েছে কিন্তু মানুষ জানেও না যে, তার স্রষ্টা তার হেফাযত ও সংরক্ষণের জন্য, তাকে জীবিকা দান করার জন্য, তার বৃদ্ধি ও বিকাশ সাধনের জন্য এবং তার কল্যাণার্থে কত রকমের সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় করে রেখেছেন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মানুষ যতই গবেষণা করছে ততই তার সামনে আল্লাহর এমনসব নিয়ামতের দরোজা উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে যা পূর্বে তার সম্পূর্ণ অগোচরে ছিল। আবার আজ পর্যন্ত যেসব নিয়ামতের জ্ঞান মানুষ লাভ করতে পেরেছে সেগুলো এমনসব নিয়ামতের তুলনায় তুচ্ছ যেগুলোর ওপর থেকে এখনো গোপনীয়তার পর্দা ওঠেনি।

৩৭. অর্থাৎ ঝগড়া ও বিতর্ক রে এমন ধরনের বিষয়াদি নিয়ে যেমন, আল্লাহ আছে কিনা? আল্লাহ কি একা, না আরো আল্লাহ আছেন? তাঁর গুণাবলী কি এবং তিনি কেমন? নিজের সৃষ্টিকুলের সাথে তাঁর সম্পর্ক কোন্ পর্যায়ের? ইত্যাদি ইত্যাদি।

৩৮. অর্থাৎ তাদের কাছে জ্ঞানের এমন কোন মাধ্যম নেই যার সাহায্যে তারা সরাসরি সত্যকে দেখতে বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার সন্ধান পেতে পারে অথবা এমন কোন পথপ্রদর্শকের পথনির্দেশনাও তাদের কাছে নেই যিনি নিজে সত্যকে দেখে তাদেরকে সে সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন। কিংবা আল্লাহর এমন কোন কিতাব তাদের কাছে নেই যার ওপর তারা এ বিশ্বাসের ভিত্তি রাখতে পারে।

৩৯. অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির, পরিবারের ও ব্যক্তির বাপ-দাদারা অবশ্যই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, এমন কোন কথা নেই। পদ্ধতিটির বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসাই তার সত্য হবার প্রমাণ নয়। বাপ-দাদা যদি পথভ্রষ্ট হয়ে থাকে, তাহলেও চোখ বন্ধ করে

وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗٓ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿٢٢﴾ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ ۗ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ ۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٢٣﴾ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٢٤﴾

যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে[৪০] এবং কার্যত সে সৎকর্মশীল,[৪১] সে তো বাস্তবিকই শক্ত করে আঁকড়ে ধরে একটি নির্ভরযোগ্য আশ্রয়।[৪২] আর যাবতীয় বিষয়ের শেষ ফায়সালা রয়েছে আল্লাহরই হাতে। এরপর যে কুফরী করে তার কুফরী যেন তোমাকে বিষণ্ন না করে।[৪৩] তাদেরকে ফিরে তো আসতে হবে আমারই দিকে। তখন আমি তাদেরকে জানিয়ে দেবো তারা কিসব কাজ করে এসেছে। অবশ্যই আল্লাহ অন্তরের গোপন কথাও জানেন। আমি স্বল্পকাল তাদেরকে দুনিয়ায় ভোগ করার সুযোগ দিচ্ছি, তারপর তাদেরকে টেনে নিয়ে যাবো একটি কঠিন শাস্তির দিকে।

তাদেরই পথে পাড়ি জমানো হবে এবং কখনো এ পথটি কোন্ দিকে গিয়েছে এ ব্যাপারে কোন প্রকার অনুসন্ধান করার প্রয়োজনই অনুভব করা হবে না, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনো এমন অজ্ঞতার কাজ করতে পারে না।

৪০. অর্থাৎ নিজেকে পুরোপুরি আল্লাহর বন্দেগীতে নিয়োজিত করে। নিজের কোন জিনিসকে আল্লাহর বন্দেগীর বাইরে রাখে না। নিজের সমস্ত বিষয় আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে দেয় এবং তাঁর প্রদত্ত পথনির্দেশকে নিজের সারা জীবনের আইনে পরিণত করে।

৪১. অর্থাৎ মুখে নিজেকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করার ঘোষণা দেয়া হবে কিন্তু কার্যত আল্লাহর অনুগত বান্দার নীতি অবলম্বন করা হবে না, এমনটি যেন না হয়।

৪২. অর্থাৎ সে এ ভয়ও করবে না যে, সে ভুল পথনির্দেশ পাবে এবং আল্লাহর বন্দেগী করলে তার পরিণাম ধ্বংস হবে, এ আশংকাও করবে না।

৪৩. সম্বোধন করা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। অর্থ হচ্ছে, হে নবী! যে ব্যক্তি তোমার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করে, সে তো নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে একথা মনে করে যে, ইসলামকে প্রত্যাখ্যান এবং কুফরীকে মেনে নিয়েও তার ওপর জোর দিয়ে সে তোমাকে অপমানিত করেছে কিন্তু আসলে সে নিজেই নিজেকে অপমানিত করেছে। সে তোমার কোন ক্ষতি করেনি বরং নিজেই নিজের ক্ষতি করেছে। কাজেই সে যদি তোমার কথা না মানে তাহলে তার পরোয়া করার প্রয়োজন নেই।

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ
لِلّٰهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ
هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ
يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۗ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ
بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾

যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী কে সৃষ্টি করেছেন, তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে আল্লাহ। বলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য।[৪৪] কিন্তু তাদের মধ্য থেকে অধিকাংশ লোক জানে না।[৪৫] আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই।[৪৬] নিসন্দেহে আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও নিজে নিজেই প্রশংসিত।[৪৭] পৃথিবীতে যত গাছ আছে তা সবই যদি কলম হয়ে যায় এবং সমুদ্র (দোয়াত হয়ে যায়), তাকে আরো সাতটি সমুদ্র কালি সরবরাহ করে তবুও আল্লাহর কথা (লেখা) শেষ হবে না।[৪৮] অবশ্যই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও জ্ঞানী। তোমাদের সমগ্র মানবজাতিকে সৃষ্টি করা এবং তারপর পুনর্বার তাদেরকে জীবিত করা (তাঁর জন্য) নিছক একটিমাত্র প্রাণী (সৃষ্টি করা এবং তাকে পুনরুজ্জীবিত) করার মতই ব্যাপার। আসলে আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও দেখেন।[৪৯]

৪৪. অর্থাৎ তোমরা যে এতটুকু কথা জানো ও স্বীকার করো এ জন্য তোমাদের ধন্যবাদ। কিন্তু এটাই যখন প্রকৃত সত্য তখন প্রশংসা সমস্তই একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত হওয়া উচিত। বিশ্ব–জাহানের সৃষ্টিতে যখন অন্য কোন সত্তার কোন অংশ নেই তখন সে প্রশংসার হকদার হতে পারে কেমন করে?

৪৫. অর্থাৎ অধিকাংশ লোক জানে না যে, যদি আল্লাহকে বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টা বলে না মেনে নেয়া হয় তাহলে এর অনিবার্য ফল ও দাবী কি হয় এবং কোন্ কথাগুলো এর বিরুদ্ধে চলে যায়। যখন এক ব্যক্তি একথা মেনে নেয় যে, একমাত্র আল্লাহই পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা তখন অনিবার্যভাবে তাকে একথাও মেনে নিতে হবে যে, ইলাহ্ ও রবও একমাত্র আল্লাহই। ইবাদাত ও আনুগত্যের হকদারও একমাত্র তিনিই। একমাত্র তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করতে এবং তাঁরই প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করতে হবে। তিনি ছাড়া আর কারো কাছে প্রার্থনা করা যেতে পারে না। নিজের সৃষ্টির জন্য আইন প্রণেতা ও শাসক তিনি

ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। একজন হবেন স্রষ্টা অন্যজন হবেন মাবুদ, এটা সম্পূর্ণ বুদ্ধি বিরোধী ও বিপরীতমুখী কথা। মূর্খতার মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে আছে একমাত্র এমন ব্যক্তিই একথা বলতে পারে। তেমনিভাবে একজনকে স্রষ্টা বলে মেনে নেয়া এবং তারপর অন্য বিভিন্ন সত্তার মধ্য থেকে একজনকে প্রয়োজন পূর্ণকারী ও সংকট নিরসনকারী, অন্যজনের সামনে ষষ্ঠাংগ প্রণিপাত হওয়া এবং তৃতীয় একজনকে ক্ষমতাসীন শাসকের স্বীকৃতি দেয়া ও তার আনুগত্য করা—এসব পরস্পর বিরোধী কথা। কোন জ্ঞানী ব্যক্তি এসব কথা মেনে নিতে পারে না।

৪৬. অর্থাৎ কেবল এতটুকুই সত্য নয় যে, পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর স্রষ্টা আল্লাহ বরং পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে যেসব জিনিস পাওয়া যায় তিনিই এসবের মালিক। আল্লাহ তাঁর এ বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করে একে এমনিই ছেড়ে দেননি যে, যে কেউ চাইলেই এর বা এর কোন অংশের মালিক হয়ে বসবে। নিজের সৃষ্টির তিনি নিজেই মালিক। এ বিশ্ব-জাহানে যা কিছু আছে সবই তাঁর মালিকানাধীন। এখানে তাঁর ছাড়া আর কারো সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হবার ইখতিয়ার নেই।

৪৭. এর ব্যাখ্যা এসে গেছে ১৯ টীকায়।

৪৮. 'আল্লাহর কথা' মানে তাঁর সৃষ্টিকর্ম এবং তাঁর শক্তি ও জ্ঞানের নিদর্শন। এ বিষয়বস্তুটি সূরা আল কাহ্ফের ১০৯ আয়াতে এর থেকে আরো একটু ভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টে এক ব্যক্তি ধারণা করবে, বোধ হয় এ বক্তব্যে বাড়াবাড়ি বা অতিকথন আছে। কিন্তু সামান্য চিন্তা করলে এক ব্যক্তি অনুভব করবে, এর মধ্যে তিল পরিমাণও অতিকথা নেই। এ পৃথিবীর গাছগুলো কেটে যতগুলো কলম তৈরি করা যেতে পারে এবং পৃথিবীর বর্তমান সাগরের পানির সাথে আরো তেমনি সাতটি সাগরের পানিকে কালিতে পরিণত করলে তা দিয়ে আল্লাহর শক্তি, জ্ঞান ও সৃষ্টির কথা লিখে শেষ করা তো দূরের কথা হয়তো পৃথিবীতে যেসব জিনিস আছে সেগুলোর তালিকা তৈরি করাই সম্ভবপর হবে না। শুধুমাত্র এ পৃথিবীতেই যেসব জিনিসের অস্তিত্ব রয়েছে সেগুলোই গণনা করা কঠিন, তার ওপর আবার এই অথৈ মহাবিশ্বের সৃষ্টির বিবরণ লেখার তো কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

এ বর্ণনা থেকে আসলে এ ধরনের একটি ধারণা দেয়াই উদ্দেশ্য যে, এত বড় বিশ্ব-জাহানকে যে আল্লাহ অস্তিত্ব দান করেছেন এবং আদি থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত এর যাবতীয় আইন-শৃংখলা ব্যবস্থা পরিচালনা করে চলেছেন তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে তোমরা যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্তাকে উপাস্যে পরিণত করে বসেছো তাদের গুরুত্ব ও মর্যাদাই বা কি! এই বিরাট-বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করা তো দূরের কথা এর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান এবং নিছক জ্ঞানটুকু পর্যন্ত লাভ করার ক্ষমতা কোন সৃষ্টির নেই। তাহলে কেমন করে এ ধারণা করা যেতে পারে যে, সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে কেউ এখানে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ক্ষমতার কোন অংশও লাভ করতে পারে, যার ভিত্তিতে সে ভাগ্য ভাঙা গড়ার ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসে?

৪৯. অর্থাৎ তিনি একই সময় সমগ্র বিশ্ব-জাহানের আওয়াজ আলাদা আলাদাভাবে শুনছেন এবং কোন আওয়াজ তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয়কে এমনভাবে দখল করে বসে না যার ফলে

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٩﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣٠﴾

তুমি কি দেখো না, আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে আসেন এবং দিনকে রাতের মধ্যে? তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মের অধীন করে রেখেছেন,[৫০] সবই চলছে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।[৫১] আর (তুমি কি জানো না) তোমরা যা কিছুই কর না কেন আল্লাহ তা জানেন। এ সবকিছু এ কারণে যে, আল্লাহই হচ্ছেন সত্য[৫২] এবং তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য যেসব জিনিসকে এরা ডাকে তা সবই মিথ্যা,[৫৩] আর (এ কারণে যে,) আল্লাহই সমুচ্চ ও শ্রেষ্ঠ।[৫৪]

একটি শুনতে গিয়ে অন্যগুলো শুনতে না পারেন। অনুরূপভাবে তিনি একই সময় সমগ্র বিশ্ব–জাহানকে তার প্রত্যেকটি জিনিস ও ঘটনা সহকারে বিস্তারিত আকারেও দেখছেন এবং কোন জিনিস দেখার ব্যাপারে তাঁর দর্শনেন্দ্রিয় এমনভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়ে না যে, একটিকে দেখতে গিয়ে তিনি অন্যগুলো দেখতে অপারগ হয়ে পড়েন। মানবকুলের সৃষ্টি এবং তাদের পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারটিও ঠিক এই একই পর্যায়ের। সৃষ্টির প্রারম্ভকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যতগুলো মানুষ জন্ম নিয়েছে এবং আগামীতে কিয়ামত পর্যন্ত জন্ম নেবে তাদের সবাইকে তিনি আবার মাত্র এক মুহূর্তেই সৃষ্টি করতে পারেন। তাঁর সৃষ্টিক্ষমতা একটি মানুষের সৃষ্টিতে এমনভাবে লিপ্ত হয়ে পড়ে না যে, সে একই সময়ে তিনি অন্য মানুষদের সৃষ্টি করতে অপারগ হয়ে পড়েন। একজন মানুষ সৃষ্টি করা বা কোটি কোটি মানুষ সৃষ্টি করা দু'টোই তাঁর জন্য সমান।

৫০. অর্থাৎ রাত ও দিনের যথারীতি নিয়মিত আসাই একথা প্রকাশ করে যে, সূর্য ও চন্দ্র একটি নিয়মের নিগড়ে বাঁধা। সূর্য ও চন্দ্রের উল্লেখ এখানে নিছক এ জন্য করা হয়েছে যে, এ দু'টি মহাশূন্যের সবচেয়ে দৃশ্যমান জিনিস এবং মানুষ অতি প্রাচীনকাল থেকে এদেরকে উপাস্যে পরিণত করে আসছে এবং আজো বহুলোক এদেরকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। অন্যথায় প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ পৃথিবীসহ বিশ্ব–জাহানের সমস্ত গ্রহ–নক্ষত্রকে একটি অনড় নিয়ম–শৃংখলা ও আইনের নিগড়ে বেঁধে রেখেছেন। এ থেকে এক চুল পরিমাণ এদিক ওদিক করার ক্ষমতা তাদের নেই।

৫১. প্রত্যেকটি জিনিসের যে বয়স তথা সময়–কাল নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে সেই সময় পর্যন্ত তা চলছে। চন্দ্র, সূর্য বা বিশ্ব–জাহানের অন্য কোন গ্রহ–নক্ষত্র কোনটাই চিরন্তন ও চিরস্থায়ী নয়। প্রত্যেকের একটি সূচনাকাল আছে। তার পূর্বে তার অস্তিত্ব ছিল

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾

৪ রুকূ'

তুমি কি দেখো না সমুদ্রে নৌযান চলে আল্লাহর অনুগ্রহে, যাতে তিনি তোমাদের দেখাতে পারেন তাঁর কিছু নিদর্শন।[৫৫] আসলে এর মধ্যে রয়েছে বহু নিদর্শন প্রত্যেক সবর ও শোকরকারীর জন্য।[৫৬] আর যখন (সমুদ্রে) একটি তরংগ তাদেরকে ছেয়ে ফেলে ছাউনির মতো তখন তারা আল্লাহকে ডাকে নিজেদের আনুগত্যকে একদম তাঁরই জন্য একান্ত করে নিয়ে। তারপর যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলদেশে পৌঁছিয়ে দেন তখন তাদের কেউ কেউ মাঝপথ বেছে নেয়,[৫৭] আর প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ ছাড়া আর কেউ আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে না।[৫৮]

না। আবার-প্রত্যেকের আছে একটি সমাপ্তিকাল। তারপর আর তার অস্তিত্ব থাকবে না। এ আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বুঝিয়ে দেয়া যে, এ ধরনের ধ্বংসশীল ও ক্ষমতাহীন বস্তু ও সত্তাগুলো উপাস্য হতে পারে কেমন করে?

৫২. অর্থাৎ প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতাধর কর্তা, সৃষ্টি ও পরিচালনা ব্যবস্থাপনার আসল ও একচ্ছত্র মালিক।

৫৩. অর্থাৎ তারা সবাই নিছক তোমাদের কাল্পনিক খোদা। তোমরা কল্পনার জগতে বসে ধারণা করে নিয়েছো যে, অমুকজন আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার অংশীদার এবং অমুক মহাত্মা সংকট নিরসন ও অভাব মোচন করার ক্ষমতা রাখেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাদের কেউ কোন কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না।

৫৪. অর্থাৎ প্রত্যেকটি জিনিসের উর্ধে এবং সবার শ্রেষ্ঠ। তাঁর সামনে সব জিনিসই নিচু। প্রত্যেকের চেয়ে তিনি বড় এবং সবাই তাঁর সামনে ছোট।

৫৫. অর্থাৎ এমন নিদর্শনাবলী দেখাতে চান যা থেকে জানা যায় একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহই সমস্ত ক্ষমতার মালিক। মানুষ যতই বিপুল ক্ষমতাসম্পন্ন ও সমুদ্র যাত্রার উপযোগী জাহাজ নির্মাণ করুক এবং জাহাজ পরিচালনা বিদ্যা ও তার সাথে সম্পর্কিত তথ্য জ্ঞান–অভিজ্ঞতায় যতই পারদর্শী হোক না কেন সমুদ্রে তাকে যেসব ভয়ংকর শক্তির সম্মুখীন হতে হয় আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া সেগুলোর মোকাবিলায় সে একা নিজের দক্ষতা

ও কৌশলের ভিত্তিতে নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে সফর করতে পারে না। তাঁর অনুগ্রহদৃষ্টি সরে যাবার সাথে সাথেই মানুষ জানতে পারে তার উপায়–উপকরণ ও কারিগরী পারদর্শিতা কতটা অর্থহীন ও অকেজো। অনুরূপভাবে নিরাপদ ও নিশ্চিত অবস্থায় মানুষ যতই কট্টর নাস্তিক ও মুশরিক হোক না কেন সমুদ্রে তূফানে যখন তার নৌযান ডুবে যেতে থাকে তখন নাস্তিকও জানতে পারে আল্লাহ আছেন এবং মুশরিকও জেনে ফেলে আল্লাহ মাত্র একজনই।

৫৬. অর্থাৎ যাদের মধ্যে এ দু'টি গুণ পাওয়া যায় তারা যখন এ নিদর্শনগুলোর মাধ্যমে সত্যকে চিনতে পারে তখন তারা চিরকালের জন্য তাওহীদের শিক্ষা গ্রহণ করে তাকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে। প্রথম গুণটি হচ্ছে, তাদের বড়ই সবরকারী (صبار) তথা অত্যন্ত ধৈর্যশীল হতে হবে। তারা অস্থিরমতি হবে না বরং তাদের পদক্ষেপে দৃঢ়তা থাকবে। সহনীয় ও অসহনীয়, কঠিন ও কোমল এবং ভালো ও মন্দ সকল অবস্থায় তারা একটি সৎ ও সুস্থ বিশ্বাসের ওপর অটল থাকবে। তাদের মধ্যে এ ধরনের কোন দুর্বলতা থাকবে না যে, দুঃসময়ের মুখোমুখি হলে আল্লাহর সামনে নতজানু হয়ে কান্নাকাটি করতে থাকবে আর সুসময় আসার সাথে সাথেই সবকিছু ভুলে যাবে। অথবা এর বিপরীত ভালো অবস্থায় আল্লাহকে মেনে চলতে থাকবে এবং বিপদের একটি আঘাতেই আল্লাহকে গালি দিতে শুরু করবে। দ্বিতীয় গুণটি হচ্ছে তাদেরকে বড়ই শোকরকারী (شكور) তথা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হতে হবে। তারা নিমকহারাম ও বিশ্বাসঘাতক হবে না, উপকারীর উপকার ভুলে যাবে না। বরং অনুগ্রহের কদর করবে এবং অনুগ্রহকারীর জন্য একটি স্বতন্ত্র কৃতজ্ঞতার অনুভূতি হর–হামেশা নিজের মনের মধ্যে জাগ্রত রাখবে।

৫৭. এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। মাঝপথকে যদি সরল ও সঠিক পথের অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে এর অর্থ হবে, তাদের মধ্যে এমন লোক খুব কমই হয় যারা তূফানে ঘেরাও হবার পর যে তাওহীদের স্বীকৃতি দিয়েছিল সে সময় অতিক্রান্ত হবার পরও তার ওপর অবিচল থাকে এবং এ শিক্ষাটি তাদেরকে চিরকালের জন্য সত্য ও সঠিক পথযাত্রীতে পরিণত করে। আর যদি মাঝপথের অর্থ করা হয় মধ্যমপন্থা ও ভারসাম্য, তাহলে এর একটি অর্থ হবে, তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক এ অভিজ্ঞতা লাভের আগের সময়ের মতো নিজেদের শিরক ও নাস্তিক্যবাদী চিন্তা–বিশ্বাসে আর তেমন একনিষ্ঠ ও শক্তভাবে টিকে থাকে না। এর দ্বিতীয় অর্থ হবে, সে সময় অতিক্রান্ত হবার পর তাদের মধ্য থেকে কিছু লোকের মধ্যে আন্তরিকতার যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তা স্তিমিত হয়ে পড়ে। আল্লাহ এখানে এ দ্ব্যর্থক বাক্যাংশটি এ তিনটি অবস্থার প্রতি ইংগিত করার জন্যই ব্যবহার করেছেন, এটারই সম্ভাবনা বেশী। তবে উদ্দেশ্য সম্ভবত একথা বলা যে, সামুদ্রিক ঝড়ের সময় সবার টনক নড়ে যায় এবং বুদ্ধি ঠিকমত কাজ করে। তখন তারা শিরক ও নাস্তিক্যবাদ পরিহার করে সবাই এক আল্লাহকে ডাকতে থাকে সাহায্যের জন্য। কিন্তু নিরাপদে উপকূলে পৌঁছে যাবার পর স্বল্পসংখ্যক লোকই এ অভিজ্ঞতা থেকে কোন স্থায়ী শিক্ষা লাভ করে। আবার এ স্বল্প সংখ্যক লোকেরাও তিনভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল, যারা চিরকালের জন্য শুধরে যায়। দ্বিতীয় দলের কুফরীর মধ্যে কিছুটা সমতা আসে। তৃতীয় দলটি এমন পর্যায়ের যাদের মধ্যে উক্ত সাময়িক ও জরুরী সময়কালীন আন্তরিকতার কিছু না কিছু বাকি থাকে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْا۟ يَوْمًا لَّا يَجْزِى وَالِدٌ عَن وَلَدِهِۦ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِۦ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿٣٣﴾

হে মানুষেরা! তোমাদের রবের ক্রোধ থেকে সতর্ক হও এবং সেদিনের ভয় করো যেদিন কোন পিতা নিজের পুত্রের পক্ষ থেকে প্রতিদান দেবে না এবং কোন পুত্রই নিজের পিতার পক্ষ থেকে কোন প্রতিদান দেবে না।[৫৯] প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য।[৬০] কাজেই এ দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদের প্রতারিত না করে[৬১] এবং প্রতারক যেন তোমাকে আল্লাহর ব্যাপারে প্রতারিত করতে সক্ষম না হয়।[৬২]

৫৮. এর আগের আয়াতে যে দু'টি গুণের বর্ণনা এসেছে তার মোকাবিলায় এখানে এ দু'টি দোষের উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বাসঘাতক এমন এক ব্যক্তি যে মারাত্মক রকমের বেঈমানী করে এবং নিজের প্রতিশ্রুতি ও অংগীকার পালন করে না। আর অকৃতজ্ঞ হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যার প্রতি যতই অনুগ্রহ করা হোক না কেন সে তা কখনোই স্বীকার করে না এবং নিজের অনুগ্রহকারীর প্রতি আগ্রাসী আচরণ করে। এসব দোষ যাদের মধ্যে পাওয়া যায় তারা বিপদ উত্তীর্ণ হবার পর নিসংকোচে নিজেদের কুফরী, নাস্তিকতা ও শিরকের দিকে ফিরে যায়। ঝড়–তুফানের সময় তারা আল্লাহর অস্তিত্বের এবং একক আল্লাহর অস্তিত্বের কিছু চিহ্ন ও নিদর্শন বাইরে ও নিজেদের মনের মধ্যেও পেয়েছিল এবং এ সত্যের স্বতস্ফূর্ত অনুভূতিই তাদেরকে আল্লাহর শরণাপন্ন হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল একথা তারা মানতে চায় না। তাদের মধ্যে যারা নাস্তিক তারা তাদের এ কাজের যে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে তা হচ্ছে এই যে, এ তো ছিল একটা দুর্বলতা। কঠিন বিপদের সময় অস্বাভাবিক অবস্থায় আমরা এ দুর্বলতার শিকার হয়েছিলাম। নয়তো আসলে আল্লাহ বলতে কিছুই নেই। ঝড়–তুফানের মুখ থেকে কোন আল্লাহ আমাদের বাঁচায়নি। অমুক অমুক কারণে ও উপায়ে আমরা বেঁচে গেছি। আর মুশরিকরা তো সাধারণভাবেই বলে থাকে, অমুক অমুক সাধুবাবা অথবা দেবী ও দেবতার ছায়া আমাদের মাথার ওপর ছিল। তাঁদের কল্যাণেই আমরা এ যাত্রায় রক্ষা পেয়েছি। কাজেই তীরে পৌঁছেই তারা নিজেদের মিথ্যা উপাস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকে এবং তাদের দরজায় গিয়ে শিন্নী চড়াতে থাকে। তাদের মনে এ চিন্তার উদয়ই হয় না যে, যখন সবদিকের সব আশা–ভরসা–সহায় ছিন্ন ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল তখন একমাত্র এক লা–শরীক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ছিল না এবং তাঁরই শরণাপন্ন তারা হয়েছিল।

৫৯. অর্থাৎ বন্ধু, নেতা, পীর এবং এ পর্যায়ের অন্যান্য লোকেরা তবুতো দূর সম্পর্কের। দুনিয়ায় সবচেয়ে নিকট সম্পর্ক হচ্ছে সন্তান ও পিতামাতার মধ্যে। কিন্তু সেখানে অবস্থা হবে যদি পুত্র পাকড়াও হয়, তাহলে পিতা এগিয়ে গিয়ে একথা বলবে না যে, তার গোনাহের জন্য আমাকে পাকড়াও করো। অন্যদিকে পিতার দুর্ভোগ শুরু হয়ে গেলে পুত্রের

একথা বলার হিম্মত হবে না যে, তাঁর বদলে আমাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দাও। এ অবস্থায় নিকট সম্পর্কহীন ভিন ব্যক্তিরা সেখানে পরস্পরের কোন কাজে লাগবে এ আশা করার কি অবকাশই বা থাকে। কাজেই যে ব্যক্তি দুনিয়ায় পরের জন্য নিজের পরকাল ঝরঝরে করে অথবা অন্যের ওপর ভরসা করে নিজে ভ্রষ্টতা ও পাপের পথ অবলম্বন করে সে একটা গণ্ডমূর্খ। এ প্রসংগে ১৫ আয়াতের বিষয়বস্তুও সামনে রাখা উচিত। সেখানে সন্তানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, দুনিয়াবী জীবনের বিভিন্ন কাজে-কারবারে অবশ্যই পিতা-মাতার সেবা করতে ও তাদের কথা মেনে চলতে হবে কিন্তু ধর্ম ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার কথায় গোমরাহীর পথ অবলম্বন কোনমতেই ঠিক নয়।

৬০. আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বলতে কিয়ামতের প্রতিশ্রুতির কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ একদিন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। তখন আল্লাহর আদালত প্রতিষ্ঠিত হবেই। সেখানে প্রত্যেককে তার নিজের কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

৬১. দুনিয়ার জীবন স্থূলদর্শী লোকদেরকে নানা রকমের ভুল ধারণায় নিমজ্জিত করে। কেউ মনে করে, বাঁচা-মরা যা কিছু শুধুমাত্র এ দুনিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এরপর আর দ্বিতীয় কোন জীবন নেই। কাজেই যা কিছু করার এখানেই করে নাও। কেউ অর্থ, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও প্রাচুর্যের নেশায় মত্ত হয়ে নিজের মৃত্যুর কথা ভুলে যায় এবং এ ভুল ধারণা পোষণ করতে থাকে যে, তার এ আরাম-আয়েশ ও কর্তৃত্ব চিরস্থায়ী, এর ক্ষয় নেই। কেউ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে কেবলমাত্র বৈষয়িক লাভ ও স্বাদ-আহলাদকে একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করে নেয় এবং "জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন" ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যকে কোন গুরুত্বই দেয় না। এর ফলে তার মনুষ্যত্বের মান যত নিচে নেমে যেতে থাক না কেন তার কোন পরোয়াই সে করে না। কেউ মনে করে বৈষয়িক সমৃদ্ধিই ন্যায়-অন্যায় ও সত্য-মিথ্যার আসল মানদণ্ড। এ সমৃদ্ধি যে পথেই অর্জিত হবে তাই সত্য এবং তার বিপরীত সবকিছুই মিথ্যা। কেউ এ সমৃদ্ধিকেই আল্লাহর দরবারে অনুগৃহীত হবার আলামত মনে করে। এর ফলে সে সাধারণভাবে মনে করতে থাকে, যদি দেখা যায় যে কোন উপায়েই হোক না কেন একজন লোক বিপুল সম্পদের অধিকারী হতে চলেছে, তাহলে সে আল্লাহর প্রিয়পাত্র এবং যার বৈষয়িক অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে, তা হক পথে থাকা ও সৎনীতি অবলম্বন করার কারণেই হোক না কেন তার পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেছে। এ ধারণা এবং এ ধরনের যত প্রকার ভুল ধারণা আছে সবগুলোকেই মহান আল্লাহ এ আয়াতে "দুনিয়ার জীবনের প্রতারণা" বলে উল্লেখ করেছেন।

৬২. الغرور (প্রতারক) শয়তানও হতে পারে আবার কোন মানুষ বা একদল মানুষও হতে পারে, মানুষের নিজের মন ও প্রবৃত্তিও হতে পারে এবং অন্য কোন জিনিসও হতে পারে। কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ বস্তু নির্ধারণ না করে এ বহুমুখী অর্থের অধিকারী শব্দটিকে তার সাধারণ ও সার্বজনীন অর্থে ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এই যে, বিভিন্ন লোকের কাছে প্রতারিত হবার মূল কারণ বিভিন্ন হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি বিশেষ করে যে উপায়েই এমন প্রতারণার শিকার হয়েছে যা সঠিক দিক থেকে ভুল দিকে তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। তা-ই তার জন্য "আল গারূর" তথা প্রতারক।

"আল্লাহর ব্যাপারে প্রতারিত করা" শব্দগুলোও অনেক ব্যাপক অর্থের অধিকারী। বিভিন্ন ধরনের প্রতারণা এর অন্তরভুক্ত হয়। কাউকে তার "প্রতারক" এ নিশ্চয়তা দেয় যে,

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

*একমাত্র আল্লাহই সেই সময়ের জ্ঞান রাখেন। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনিই জানেন মাতৃগর্ভে কি লালিত হচ্ছে। কোন প্রাণসত্তা জানে না আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কোন ব্যক্তির জানা নেই তার মৃত্যু হবে কোন্ যমীনে। আল্লাহই সকল জ্ঞানের অধিকারী এবং তিনি সবকিছু জানেন।*৬৩

আল্লাহ আদতেই নেই। কাউকে বুঝায়, আল্লাহ এ দুনিয়া সৃষ্টি করে হাত–পা গুটিয়ে বসে গেছেন এবং এখন এ দুনিয়া তিনি বান্দাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। কাউকে এ ভুল ধারণা দেয় যে, আল্লাহর এমন কিছু প্রিয়পাত্র আছে, যাদের নৈকট্য অর্জন করে নিলে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে। তুমি নিশ্চিতভাবেই ক্ষমার অধিকারী হবে। কাউকে এভাবে প্রতারণা করে যে, আল্লাহ তো ক্ষমাশীল ও করুণাময়। তোমরা পাপ করতে থাকো, তিনি ক্ষমা করে যেতে থাকবেন। কাউকে বুঝায়, মানুষ তো নিছক একটা অক্ষম জীব ছাড়া আর কিছুই নয়। তার মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি করে দেয় এই বলে যে, তোমাদের তো হাত–পা বাঁধা, যা কিছু খারাপ কাজ তোমরা করো সব আল্লাহই করান। ভালো কাজ থেকে তোমরা দূরে সরে যাও, কারণ আল্লাহ তা করার তাওফীক তোমাদের দেন না। নাজানি আল্লাহর ব্যাপারে এমনিতর কত বিচিত্র প্রতারণার শিকার মানুষ প্রতিদিন হচ্ছে। যদি বিশ্লেষণ করে দেখা হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি গোমরাহী, গোনাহ ও অপরাধের মূল কারণ হিসেবে দেখা যাবে, মানুষ আল্লাহর ব্যাপারে কোন না কোন প্রতারণার শিকার হয়েছে এবং তার ফলেই তার বিশ্বাসে দেখা দিয়েছে বিভ্রান্তি অথবা সে নৈতিক চরিত্রহীনতার শিকার হয়েছে।

৬৩. এটি আসলে একটি প্রশ্নের জবাব। কিয়ামতের কথা ও আখেরাতের প্রতিশ্রুতি শুনে মক্কার কাফেররা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বারবার এ প্রশ্নটি করতো। প্রশ্নটি ছিল, সে সময়টি কবে আসবে? কুরআন মজীদে কোথাও তাদের এ প্রশ্নটি উদ্ধৃত করে জবাব দেয়া হয়েছে আবার কোথাও উদ্ধৃত না করেই জবাব দেয়া হয়েছে। কারণ শ্রোতাদের মনে এ প্রশ্ন জাগরুক ছিল। এ আয়াতটিতেও প্রশ্নের উল্লেখ ছাড়াই জবাব দেয়া হয়েছে।

"একমাত্র আল্লাহই সে সময়ের জ্ঞান রাখেন" এ প্রথম বাক্যটিই মূল প্রশ্নের জবাব। তার পরের চারটি বাক্য এ জবাবের স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে পেশ করা হয়েছে। যুক্তির সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে, যেসব বিষয়ের প্রতি মানুষ নিকটতম আকর্ষণ অনুভব করে সেগুলো সম্পর্কেও তার কোন জ্ঞান নেই। তাহলে সারা দুনিয়ার শেষ ক্ষণটি কবে ও কখন আসবে, একথা জানা তার পক্ষে কেমন করে সম্ভব? তোমাদের সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা

বিরাটভাবে নির্ভর করে বৃষ্টির ওপর। কিন্তু আল্লাহর হাতে রয়েছে এর পুরো যোগসূত্র। যেখানে যখন যতটুকু চান বর্ষণ করান এবং যখনি চান থামিয়ে দেন। কেউ একটুও জানে না কোথায় কখন কতটুকু বৃষ্টি হবে এবং কোন্ ভূখণ্ড তা থেকে বঞ্চিত হবে অথবা কোন্ ভূখণ্ডে বৃষ্টি উল্টো ক্ষতিকর প্রমাণিত হবে। তোমাদের বীর্যে তোমাদের স্ত্রীদের গর্ভসঞ্চার হয় এবং এর সাথে তোমাদের বংশধারার ভবিষ্যত জড়িত। কিন্তু তোমরা জানো না এ গর্ভে কি লালিত হচ্ছে এবং কোন্ আকৃতিতে ও কোন্ ধরনের কল্যাণ বা অকল্যাণ নিয়ে তা বের হয়ে আসবে। আগামীকাল তোমাদের কি হবে তা-ও তোমরা জানো না।

একটি আকস্মিক দুর্ঘটনা তোমাদের ভাগ্য বদলে দিতে পারে। কিন্তু এক মিনিট আগেও তোমরা তার খবর পাও না। তোমরা এও জানো না, তোমাদের এ জীবনের সমাপ্তি ঘটবে কোথায় কি অবস্থায়। এ সমস্ত তথ্যজ্ঞান আল্লাহ নিজেরই কাছে রেখেছেন এবং এর কোন একটির জ্ঞানও তোমাদের দেননি। এর মধ্যে প্রত্যেকটি জিনিসই এমন যে সম্পর্কে তোমরা পূর্বাহ্নেই কিছু জানতে চাও যাতে এ জ্ঞানের সাহায্যে তোমরা আগেভাগেই কিছু পদক্ষেপ নিতে পারো। কিন্তু সেসব ব্যাপারে আল্লাহর নিজস্ব ব্যবস্থাপনা এবং তাঁর ফায়সালার ওপর ভরসা করো। এভাবে দুনিয়ার শেষক্ষণটির ব্যাপারেও আল্লাহর ফায়সালার প্রতি আস্থা স্থাপন করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এর জ্ঞানও কাউকে দেয়া হয়নি এবং দেয়া যেতে পারে না।

এখানে আর একটি কথাও ভালোভাবে বুঝে নেয়া দরকার। সেটি হচ্ছে, যেসব বিষয় আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না তেমনি ধরনের গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়াবলীর কোন তালিকা এখানে দেয়া হয়নি। এখানে তো কেবলমাত্র হাতের কাছের কিছু জিনিস উদাহরণ স্বরূপ পেশ করা হয়েছে। যেগুলোর প্রতি মানুষের গভীরতম ও নিকটতম আকর্ষণ ও আগ্রহ রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। এ থেকে এ সিদ্ধান্ত টানা ঠিক হবে না যে, মাত্র এ পাঁচটি বিষয়ই গায়েবের অন্তরভুক্ত, যে সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ কিছুই জানে না। অথচ গায়েব এমন জিনিসকে বলা হয় যা সৃষ্টির অগোচরে এবং একমাত্র আল্লাহর দৃষ্টি সমক্ষে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এ গায়েবের কোন সীমা পরিসীমা নেই। (এ বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নাহ্‌ল, ৮৩ টীকা)